



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 131 - 139

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মহাশ্বেতা দেবীর গল্প : ক্ষমতাতন্ত্র বনাম তথাকথিত নিম্নবর্গের ক্ষমতায়ন

তনয়া দাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: tanayadasmi@gmail.com

 0009-0003-2097-251X

Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Upper Class,
Lower Class,
Protest, Unity,
Exploitation,
Empowerment,
Power Structure,
Tribe Society,
Subaltern.

Abstract

If we look at the history of the world, we will see that for ages, one class of people has ruled, and another class of people has been ruled. Most of the time, the powerful want to oppress the weak. They control a class according to their wishes. But sometimes, the lower class in the social structure unites or individually resists the power. They take power into their own hands. As a result, the weak become strong and they control that power according to their needs. When this resistance develops from being oppressed, another history is created. Mahasweta Devi has written numerous stories and novels on the subject of the weak becoming strong, doing something for themselves. How this issue is highlighted in Mahasweta Devi's short stories will be discussed in this article by selecting a few stories. The stories selected for this article are 'Behula', 'Jatudhan', 'Bichan', 'Draupadi'.

Discussion

সাধারণত ক্ষমতাতন্ত্রের গঠনে দেখা যায় একদল মানুষ অর্থ, রাজনৈতিক শক্তি, পদমর্যাদা ইত্যাদির জোরে ক্ষমতা দখল করে এবং বিপরীত প্রান্তের মানুষ হয় শাসিত। অর্থাৎ ক্ষমতাদানের হাতে ক্ষমতাহীনরা অত্যাচারিত হয়। কিন্তু একচেটিয়া ভাবে ক্ষমতা কখনো কারো কাছে আবদ্ধ থাকে না। ক্ষমতা একটি প্রবাহিত শক্তির মতো। একরকম পরিস্থিতিতে যে শক্তিশালী অপর কোনো এক পরিস্থিতিতে সে দুর্বল। এই বিষয়টি সহজভাবে বলতে গিয়ে রমেশ চন্দ্র তাঁর 'ফুকো' বইতে উদাহরণ হিসেবে বলেছেন কোনো একজন প্রধানমন্ত্রী, যে দেশকে শাসন করে সেই মানুষটি বাড়িতে হয়তো স্ত্রীকে ভয় পায়। অর্থাৎ দেশের ক্ষমতাদার ব্যক্তি বাড়িতে ক্ষমতাহীন। পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার হাত বদল ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত হতে হতে অত্যাচারিত মানুষ কোনো এক সময় সাহস সঞ্চয় করে প্রতিবাদের ক্ষমতা অর্জন করে। তখন গড়ে ওঠে প্রতিরোধের আলেখ্য। ক্ষমতাতন্ত্রের নিচে অবস্থিত মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেয়। নিজেদের যোগ্য পাওনা বুঝে নিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। যার দৃষ্টান্ত হিসেবে মহাশ্বেতা দেবী কয়েকটি গল্পকে নির্বাচন করা হয়েছে। যেমন বেহুলা, জাতুধান, বিছন, দ্রৌপদী ইত্যাদি।

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে নিম্নবর্গ নিয়ে আলোচনার পূর্বে নিম্নবর্গ বিষয়টির উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন।

“নিম্নবর্গের আলোচনায় উঠে আসে আধিপত্যের কথা। মানব সভ্যতার উষাকাল থেকে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাত চলে আসছে। দেশে দেশে কালে কালে এর কিছু অদল-বদল কিংবা বিবর্তন নজরে আসা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তামাম দুনিয়ায় কাল পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিয়েছে কতই না তত্ত্ব দর্শন। ‘Sub-altern Theory’ বা ‘নিম্নবর্গের তত্ত্ব’ তারই একটি।”^১

এই সাবঅলটার্ন শব্দটি প্রথম ইতালীয় দার্শনিক ও মার্কসবাদী নেতা আন্টোনিও গ্রামশির ‘দ্য প্রিজন নোটবুক’ (The Prison Note book, ১৯৭১)। গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যায়। আভিধানিক অর্থে সাবঅলটার্ন বলতে অধীনস্থ কর্মচারী বা কারো নিম্নে অবস্থিত কর্মচারীকে বোঝানো হয়। কারো কাছে অধীনতার সূত্র ধরে গ্রামশির ‘হেজেমনি’ বা আধিপত্যের ধারণাটি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সাবঅলটার্ন প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন।

অভিধানের অর্থ অনুযায়ী সাবঅলটার্ন শব্দটি সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত অধস্তন কর্মচারী বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। গ্রামশি এই সাবঅলটার্ন শব্দটিকে ‘প্রলেতারিয়েত’ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কারণ তাঁর মতে পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোর মধ্যে সাবঅলটার্ন হল শ্রমিক শ্রেণি। বুর্জোয়া সমাজের বিপরীতে এই শ্রেণি অবস্থান করে। এই শ্রেণি শোষিত ও শাসিত হয়। শুধুমাত্র পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোর মধ্যে নয়। সমগ্র সমাজের মধ্যে এই শাসক ও শোষিত শ্রেণি রয়েছে।

আর হেজেমনি বলতে শাসকশ্রেণির নৈতিকতা, বিশ্বাস ও বৌদ্ধিক নেতৃত্বের একটি বিশেষ জাল তৈরির ক্ষমতাকে বোঝায়, যা সমাজের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। সরাসরি জোর করে নয়, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের উন্নতির কথা বুঝিয়ে সূক্ষ্ম চিন্তা ভাবনার প্রসার ঘটিয়ে নিজেদের মতের পক্ষে শাসক শ্রেণি সম্মতি আদায় করে। পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় পুঁজিবাদীরা হয়ে ওঠে প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নাগরিক সমাজের উন্নতি ঘটে এই পুঁজিবাদীদের হাত ধরে। ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাদের হাতে থাকে। ক্ষমতার বিভেদের ফলে শোষকে ও শাসিত দুই শ্রেণির মধ্যে সংঘর্ষ বা রেযারেযি তৈরি হয়। আশির দশকে ভারতীয় চিন্তাবিদ রণজিৎ গুহ গ্রামশির এই তত্ত্বকে ‘Elementary Aspects of Peasant Insubordination in Colonial India’ (1983) গ্রন্থে ভারতীয়করণ করেন। নিম্নবর্গের ইতিহাস’ অভিসন্দর্ভের তিনি বলেছেন—

“উচ্চবর্গ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল। প্রভুস্থানীয়দের দু’ভাগে ভাগ করা যায়— বিদেশিও দেশি। বিদেশী প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে যারা এই সংজ্ঞাসম্মত তারাও দু’ধরনের— সরকারি ও বেসরকারি।”^২

এই প্রবন্ধে আলোচ্য গল্পগুলিতে এই দুই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে

“Prison Notebooks’ গ্রন্থে আন্টোনিও গ্রামসি সাবঅলটার্ন বলে যাদেরকে চিহ্নিত করেছেন, আধিপত্যের রাজনীতিতে যারা যুগ-যুগান্ত ধরে নিষ্পেষিত-সেই নিম্নবর্গের রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, উচ্চবর্গীয় প্রতাপের প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ কখনো কখনো সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল হতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পারে না।”^৩

কিন্তু যখন সুশৃঙ্খলিতভাবে সেই প্রতিবাদী স্বর জেগে ওঠে তখনই মহাশ্বেতা দেবী তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ লিখতে পারেন ‘বেহুলা’, ‘বিছন’, ‘দ্রৌপদী’, ‘জাতুধন’- এর মতো গল্প।

বেহুলা গল্পটি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে ‘প্রমা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দেখা যায় বেহুলা গ্রামের অধিবাসীরা বাঁচতে চেয়েও বাঁচতে পারে না। হেদো নক্ষর পঞ্চায়েত প্রধান হয়ে ইটের পাঁজায় সাপের বংশবিস্তারের ব্যবস্থা করে রাখে। গোখরো সাপের পরে কালাজ সাপের বিষে সর্বাধিক লোক মরে। কিন্তু সেই বিষের প্রতিষেধক গ্রামে পাওয়া যায় না। এমনকি ডাক্তার সাপে কামড়ানো মানুষকে বাঁচাতে চেয়েও ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অসহায় ভাবে মানুষের মৃত্যু দেখে। ওষুধ চেয়েও ডাক্তার নার্স ওষুধ পায় না। শুধুমাত্র হাসপাতাল নয়, বাজারেও সাপের ওষুধ পাওয়া যায় না। মুনাফা

সেখানে বড় হয়ে ওঠে। ওষুধ কোম্পানি অর্থাৎ পুঁজিবাদী শক্তি মানুষের জীবন নিয়ে ব্যবসা করে। মহাশ্বেতা দেবীর এই গল্পে রাষ্ট্রশক্তির পরিসংখ্যানের প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ ছুড়ে দেন —

“সর্প-দংশন কোন ওষুধ কোম্পানিকে আগ্রহী করতে পারে না। কেন না সাপ কামড়ায় চার লাখ মানুষকে, মরে হাজার বিশেক। খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার হল, বছ বছর ধরে ওই বিশ হাজার মৃত্যুর পরিসংখ্যান থেকে যাচ্ছে প্রায় এক চেহারা। ভারতে কি সাপ ও মানুষে কোন সমঝোতা আছে?”^৪

ওষুধ কোম্পানি সাপের কামড়ের প্রতিষেধক তৈরি করতে চায় না। কারণ তাতে ব্যবসাদার বা রাষ্ট্রের কোনো আর্থিক লাভ হয় না। এখানে আমরা অ্যান্টনিও গ্রামসির হেজিমনির তত্ত্বকে মনে করতে পারি। সেখানে উচ্চ শ্রেণির ক্ষমতার দাপটে নিম্নবর্গকে চিহ্নিত করা হয়। পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় যেহেতু বিত্তশালীদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে সেহেতু তাদের লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে সমাজের উন্নতির মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়। ফলে পুঁজিবাদীদের দ্বারা সমাজ তথা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এই গল্পে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ বর্ষিত হয়েছে।

গ্রামের মানুষ নিজেদের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেহুলা ও লক্ষ্মিন্দরের নতুন কাহিনি গড়ে তোলে। সেখানে বেহুলা দেব সবাই নৃত্য পরিবেশন করার জন্য লক্ষ্মিন্দরকে বাঁচিয়ে ফিরে আনলেও স্বর্গে ফিরে যেতে পারে না। তাকে নাচ দেখানোর প্রায়শ্চিত্ত করতে সাপে কাটা মানুষের লাশ বয়ে নিয়ে যেতে হয়। আর লক্ষ্মিন্দরের মতো গ্রামবাসী ‘প্যাসিভ’ চরিত্র হয়ে থেকে যায়। মানুষ আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা না পেয়ে শ্রীপদ ওঝার কাছে যায়। কিন্তু শ্রীপদ কোনো কুসংস্কারছন্ন ওঝা নয়। শ্রীপদ পড়াশোনা করতে চেয়েও করতে পারে না। কারণ তার কাছে অর্থের শক্তি ছিল না। সমাজে শিক্ষিত মানুষ বৃদ্ধি পেলে রাষ্ট্রশক্তি নিজেদের মতো চক্র চালাবে কী? কখনো জাত পাতের কারণ দেখিয়ে বা কখনো অর্থের অভাব দেখিয়ে উচ্চ সম্প্রদায় যদি নিম্নবর্গের উপর শাসন না চালায় তাহলে তো একচেটিয়া শাসনব্যবস্থা চলবে না। সেখানে ধনী আরো ধনী হয় এবং গরিব হয় আরো গরিব। তাই শ্রীপদ পড়াশোনা করতে চায়লে তাকে শুনতে হয় –

“আজ মালের পো পড়বে, কাল জেলের পো পড়বে, পরশু তোরা মাতায় পা রেকে চলবি।”^৫

রাষ্ট্রশক্তি এই শিক্ষিত সমাজকে ভয় পায়। জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়লে তাদের অর্থ কৌলিন্যের খুঁটি পুজো করবে কে? নিজেদের স্বার্থে সাধারণ মানুষকে যা খুশি তাই বোঝানো কঠিন হয়ে যাবে।

সন্তোষ কুমার ঘোষ ‘বিছন’ গল্প পড়ে মহাশ্বেতা দেবী কে বলেছিলেন –

“শেষ হয়ে যাবার আগে আপনি শেষবারের মতো জ্বলে উঠেছেন।”^৬

গল্পটি পড়লে সহৃদয় পাঠককেও সততা জ্বলেও উঠতে হয়। নিজের মধ্যে কতটা আগুন থাকলে এইরকম একটা গল্প একদিনে রাত দুটো পর্যন্ত লিখে শেষ করা যায় তা পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই গল্পে গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ শুধু বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে। কাজ করেও তারা ন্যায্য মূল্য পায় না। অথচ নিচু জাতের মানুষ হওয়ার কারণে রাজপুত্র জমিদারের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস তাদের থাকে না।

নিজেদের স্বার্থে জমিদাররা অনুর্বর পতিত জমি গ্রামের লোকদের দান করে, পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষমতা তন্ত্রের ভিত্তি শক্ত করা হয়।

“জমি দেবার ব্যাপারটি সর্বার্থসাধক। বাঁজা জমি বেরিয়ে গেল। গ্রহীতাদের কিনে রাখা গেল। সরকারের কাছে নিজেদের খুঁটি আরও শক্ত হল। শেষপাতে রসগোল্লার মতো সর্বোপরি রইল নিজেকে করুণাময় জানার আনন্দ।”^৭

এই জমি দুর্ভাগ্যক্রমে বা সৌভাগ্যক্রমে গঞ্জু জাতির একজন প্রতিনিধি দুলানের হাতে আসে। এরা তথাকথিত সমাজের নিচু জাতি হিসেবে পরিচিত। মৃত পশুর চামড়া ছিলে বাজারে বিক্রি করা তাদের কাজ। সেই দুলানকে জোর করে লহমন সিং জমি নিতে বাধ্য করে এবং পতিত জমিতে চাষ করার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধানের বীজ, চাষের টাকা আনার ব্যবস্থা করে দেয়। সেই ধান বীজ থেকে চাল বের করে দুলানের পরিবার সেই ভাত খায়। তার স্ত্রী যখন বলে বিছন খেয়ে মরবে তখন দুলানের উত্তর –

“এততে মরলাম না। আকালে হুঁদুর খেলাম কত? বিছন খেয়ে মরব? মরলে জানব, ধানের ভাত খেয়ে মরেছি। স্বর্গে যাব।”^৮

বেঁচে থাকার এই লড়াই বুঝিয়ে দেয় মানুষগুলোর অবস্থা। প্রতিনিয়ত তারা লড়াই করে চলে অস্তিত্বের সংকটের সঙ্গে। ভাত প্রীতির এই দৃশ্য দেখে ‘ভাত’ গল্পের উচ্ছবের কথা যেমন মনে পড়ে তেমনি মনে পড়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘গোম্ব’ গল্পের কথা। হারাই সেখানে ভাতকে বলে ‘বড় মিঠা’ ‘শাহদান’। ভাত খেয়ে বেঁচে থাকার মত নূন্যতম সুখ যারা পায় না ভাত এইসব মানুষদের কাছে রাজকীয় খাবার। বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’ উপন্যাসেও দেখা যায় বড়ো বড়ো অনুষ্ঠান ও ধনী বাড়ি ছাড়া ভাতের দেখা পাওয়া যায় না। তাই ভাত বড় মূল্যবান। এই ভাতের দায়েই দুলনের মতো অসহায় মানুষরা লছমন সিংদের মতো অমানুষদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না। আর বেঁচে থাকা শুধু নয়, ভালোভাবে ন্যায্য পাওনা বুঝে যারা বাঁচতে চায়, সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর স্বপ্ন দেখাতে চাই, ক্ষমতাধরের সামনে যারা চোখে চোখ রেখে নিজেদের দাবি জানায় তাদের অবস্থা হয় করণ, আশরফি, মল্লবন, পারশ, বুলাকি, মোহর, ধাতুয়ার মতো। কারণ ক্ষমতাধরের বিরুদ্ধে –

“যো মু খোলে গা, যো ভি লাশ বনে গা। ... সরকারি কানুন – অফিসার নিয়োগ ও সংবিধানে ঘোষণা কিছু নয়। রাজপুত রাজপুতই থাকে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকে, দুসাদ-চামার-গঞ্জু-ধোবি, এরা থাকে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-রাজপুত-ভূঁইহার-কুর্মিদের নীচে।”^৯

সেই জাতের কারণে পতিতা জমিতে লছমন সকল যুবকের লাশ পুঁতে যায়। আর দুলন অসহায় ভাবে প্রভুর আদেশে মাথা নাড়ে এবং অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বাইরে নীরব থাকলেও তার ভেতরে আগুন জ্বলে।

দুলন নামটি আরেকটি নামকে মনে করিয়ে দেয়। তা হল দুলাল মাহাতো। সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’ গল্পে দুলাল মাহাতো কুর্মি প্রজাদের অধিকারের দাবিতে লড়তে গিয়ে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও ধনতান্ত্রিক খনির মালিকদের চক্রান্তে লাশে পরিণত হয়। এই গল্পে দুলনের ছেলে ধাতুয়া গান লিখেছে যারা প্রতিবাদ করেছিল –

“তারা পুলিশের খাতায় হারিয়ে গেছে।”^{১০}

তেমনই ফসিল গল্পে বিবেক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত মি. মুখার্জি ভাবে —

“লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা যাদুঘরে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল! অর্দ্ধপশুগঠন, অপরিণতমস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাবহিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের প্রস্তরীভূত অস্থিকঙ্কাল আর ছেনি হাতুড়ি গাঁইতা— কতগুলি লোহার ড্রুড কিস্তুত অস্ত্রশস্ত্র, যারা আকস্মিক কোন ভূবিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রানিটের স্তরে স্তরে সমাপিত হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতকগুলি সাদা সাদা ফসিল; তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই!”^{১১}

প্রভুদের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করে তাদের চিহ্ন কোথাও থাকে না কিন্তু তাদের প্রতিবাদ মিথ্যে হয় না। তাদের প্রতিবাদ অন্যের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। যেমন এই গল্পে লাশ পুতে রাখা জমিতে পাহারা দিতে দিতে দুলাল যখন ছেলের লাশ পুঁতে তখন তার পৃথিবী হৃদয়ের ব্যথায় মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। সেই অসহ্য কষ্টই তীব্র প্রতিবাদ হয়ে ফিরে আসে গল্পের শেষে। একাধিক মৃতদেহ সারে পরিণত হয়ে পতিতা জমিকে উর্বর করে। সেই জমির ধানের টানে লছমন দুলনের কাছে আসে। আর উচ্চ জাতি হয়ে নিচু জাতির হাতে লছমন সিংকে মরতে হবে এই বিদ্রূপ করার সুযোগ পায় দুলন। চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে এক পিতৃ হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে ক্ষোভ। শুধু ধাতুয়ার পিতা নয়, সকল অভাগা সন্তানের পিতা ও তাদের সমাজের প্রতিনিধি হয়ে দুলাল বলে —

“কী কথা ছিল মালিক? চাষ করব না! কেন করব না? তুমি লাশ পুঁতেবে, আমি হব লাশের জিন্মাদার। কেন হব? নইলে তুমি গ্রাম জ্বালাবে, আমাকে নির্বংশ করবে। খুব ভাল। কিন্তু মালিক সাত-সাতটা ছেলে! শুধু বন-ঝোপ-কাঁটাগাছ হবে তাদের গোরে? তাই ধান বুনেছি, জান? সবাই বলে পাগল, আমি

পাগলই হয়েছে। আজ আর তোমায় যেতে দিব না মালিক, আর ফসল কাটাতে দিব না। গুলি চালাতে, ঘর জ্বালাতে, মানুষ জ্বালাতে আর দিব না। অনেক ফসল কাটলে তুমি।”^{১২}

সে অসহায়ভাবে মরতে আর রাজি নয়। জীবনে সবাই একবার মরে, সে এবার মেরে মরতে চেয়েছে। পাথর দিয়ে ছেঁচে লছমনকে হত্যা করে। এই পাথর ছাঁচার মধ্যে দিয়ে তার অন্তর সংগ্রামের রূপ প্রকাশিত হয়। পাথর চাপা দিয়ে এসে লসমন সিং এর মৃতদেহকে ঢেকে দেয় এবং ছোট জাতির মতো কবর নিতে হল বলে লসমন সিংকে বিদ্রূপ করে। এই বিদ্রূপ দীর্ঘদিনের উঁচু জাতের অত্যাচারের ফল। মৃত্যুর সময় সম্মানের সঙ্গে শেষকৃত্য পাওয়া যাদের অধিকার ছিল কিন্তু প্রেমচাঁদ মুন্সির ‘সদগতি’ গল্পের দুখিরামের মতো তাদের শেষকৃত্য হয় অসম্মানের সঙ্গে—

“ওদিকে শকুন ও শেয়াল আর কুকুর ও কাক মিলে মাঠের মধ্যে দুখির লাশ ছিঁড়ে খেতে লাগল।

আজীবন ভক্তি, সেবা আর নিষ্ঠার এই হল পুরস্কার।”^{১৩}

—এই পুরস্কারের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানিয়েছে দুলন। তার নীরব প্রতিবাদে বীভৎসতা ফুটে ওঠে। দুলন লছমন সিংয়ের শেষকৃত্য পাথর চাপা দিয়ে করে।

মানুষ অত্যাচারিত হতে হতে মরিয়া হয়ে এমন প্রতিবাদ করে। বিছন অর্থাৎ বীজ এখানে বেঁচে থাকার প্রতীক। বীজ থেকে নতুন চারা হয়। যে চারা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। শেষে দুলন তার ছেলের উদ্দেশ্যে বলে তাদেরকে সে বীজ বানিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তাদের দেহে পুষ্ট মাটিতে যে ধান হয়েছে সেই ধান থেকে বীজ করে সে গ্রামের সকলকে দিয়েছে এবং নিজে আবার ধান চাষ করার কথা ভেবেছে। করন যে কথা সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল জাত পাত সব মিথ্যে দুলন তা কাউকে বোঝাইনি। কিন্তু নিজের সেই চৈতন্যে সে নিজের মতো করে প্রতিবাদ করেছে। বীজের মধ্যে যেমন প্রাণ সুপ্ত হয়ে থাকে। দুলনের মধ্যে প্রতিবাদ সুপ্ত হয়ে থেকেছে এবং বীজ থেকে যেমন ধান হয়েছে তেমনি সেই সুপ্ত ক্ষোভ গল্পের শেষে প্রতিবাদ রূপে প্রকাশিত হয়েছে। একটা লছমন সিংকে মেরে ফেললে লছমন সিং এর মতো পাশও মানুষদের সকলকে উচ্ছেদ করা যাবে না। কিন্তু মানুষ যে ভয় ভেঙে এমন লছমন সিংদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিতে পারে, সমাজ কাঠামোর নিচে থেকেও মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে, তার দৃষ্টান্ত এই ‘বিছন’ গল্পের দুলন। যেখানে বীজ নতুন ভাবে বাঁচার ইঙ্গিত দেয়।

মহাশ্বেতা দেবীর লেখা ‘দ্রৌপদী’ বাংলা সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি। গল্পটি ‘অমৃত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮০ সালে ‘অগ্নিগর্ভ’ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সত্তরের দশকের পটভূমিতে তিনি সৃষ্টি করেছেন এই গল্প। জমিদার, মহাজন যখন সরকারের পৃষ্ঠপোষক এবং সরকার এইসব মানুষদের রক্ষা করতে তৎপর; সেই সময় এই ক্ষমতাবান লোকেরা নিজেদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত রুঢ় শুষ্ক পরিবেশে নিজেদের প্রয়োজন মতো কুয়ো তৈরি করেছে। অথচ সাধারণ মানুষ সেই জলের সুবিধা পায়নি। তারা নিজেদের দাবী জানাতে গেলে তারা হয়ে যায় অপরাধী। সাধারণভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে খাদ্য সংস্থানের প্রয়োজন হয় সেই খাদ্য সংস্থানের দাবিতে মানুষকে তৎপর হয়ে উঠতে হয়।

“সূর্য সাউ বিড়িবাঁবুর সঙ্গে ষড় করে দু বছরে বাড়ির চৌহদ্দিতে দুটো টিউবয়েল বসাল, কুয়ো খুঁড়ল তিনটে। কোথাও জল নেই, বীরভূমে খরা। সূর্য সাউয়ের বাড়িতে অথই জল, কাকের চোখের মত নির্মল।”^{১৪}

রাগে ক্ষোভে এইসব বিপ্লবী মানুষ শহরের কিছু ছেলের সহায়তায় মহাজনের বাড়ি ঘেরাও করে এবং মহাজনকে খুন করে। তারা এই সব বিপ্লবীদেরকে নানা রকম খবর এনে দেয়, তাদের কাজে সহায়তা করে। এইজন্য তারা সরকারের চোখে অপরাধী। সেইরকম একজন অপরাধী হচ্ছে ‘দ্রৌপদী’ গল্পের দ্রৌপদী মেবোন ও তার স্বামী দুলন। জল পানরত অবস্থায় দুলনকে হত্যা করা হয়। আর দ্রৌপদীকে গ্রেফতার করার জন্য করা হয় এক বিশাল চক্রান্ত। এই আদিবাসী শ্রেণি তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের চোখে মানুষ হিসেবে গণ্য নয়। গল্পে দেখা যায় তাদেরকে দেখামাত্রই গুলি করার নির্দেশ থাকে। গেরিলা পদ্ধতিতে যারা যুদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা করা হবে, এই ছিল সরকারের নিয়ম। আর এই গেরিলা পদ্ধতিতে দক্ষ দ্রৌপদীকে ধরার জন্য চক্রান্ত করা হয়। কিন্তু অন্য সকলের থেকে আদিবাসী এই মেয়েটি ও তার স্বামী আলাদা। কারণ সে তারা বুদ্ধিদীপ্তির পরিচয় দিয়েছে। ক্ষমতাতন্ত্রের শীর্ষে অবস্থিত তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মত অনুযায়ী, নিচের

সম্প্রদায়ের মানুষের এত বুদ্ধি থাকা উচিত ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে দ্রৌপদী(দোপদি) এবং দুলনের এমনই বুদ্ধি ছিল যে তারা বারবার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। মরে যাওয়ার অভিনয় করে শুয়ে থেকে সেখান থেকে উঠে পালিয়েছে। তা দেখে পুলিশের চোখের ঘুম উড়ে গিয়েছে। বাস্তবে সেনানায়ক তাদের উপর অত্যাচার করার তীব্র বাসনা পোষণ করে। আবার একইভাবে নিজের ভালো মানুষের ছবি ধরে রাখতে তাদের যুদ্ধকে প্রশংসা চোখে দেখে। সব কালে সেনানায়ক নিজে প্রশংসার যোগ্য হয়ে উঠতে চায়। তা যদি মিথ্যের আবরণ দিয়ে তৈরি হয় তাতেও তার কিছু যায় আসে না। এই সেনানায়ক চক্রান্ত করে দুলনকে হত্যা করার পরে দ্রৌপদীকে গ্রেপ্তার করে। তাদের চোখে যে অপরাধী তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো, সেটা আইনত একটি পদ্ধতি। কিন্তু তারপরে যে ভয়ানক অত্যাচার দ্রৌপদীর উপরে করা হয় তা কোনো পদ্ধতি নয়, তা নৃশংসতা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মহারাষ্ট্র রাজ্যের গদচিরোলি জেলার দোসাইগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে ১৯৭২ সালের ২রা মার্চ মথুরা নামে এক অনাথ আদিবাসী তরুণী মেয়েকে দুই পুলিশ ধর্ষণ করে। মেয়েটির পরিবারের লোকজন এই চরমতম অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে দুজন পুলিশের নামে জজ আদালতে নালিশ করে। কিন্তু আদালতের রায়ে বলা হয় মথুরা যেহেতু যৌনমিলনে অভ্যস্ত তাই তার সম্মতিতে স্বেচ্ছায় যৌন মিলন হয়েছিল। সেই কারণে শুধু যৌন মিলন প্রমাণিত হতে পারে, ধর্ষণ প্রমাণিত হয় না। তারপরে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বোম্বে হাইকোর্টে আপিল করা হয়। সেখানে বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চ অভিযুক্তদেরকে এক এবং পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয়। কিন্তু এই দু-জন অভিযুক্ত পুনরায় ১৯৭৯ সালে সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করে। সুপ্রিমকোর্ট অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস করে দেয়। সুপ্রিমকোর্ট বলে, মথুরা কোনো শঙ্কা প্রকাশ করেনি, তার শরীরেও কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় না, তাই অনিচ্ছাকৃত জোরপূর্বক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। এই রায়ের বিরুদ্ধে সেদিন অনেকে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। যেমন দিল্লি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক উপেন্দ্র বক্সী, লতিকা সরকার, রঘুনাথ কেক্কার প্রমুখরা। এই ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীতে ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে ‘দ্যা ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট’ এর মাধ্যমে ভারতের ধর্ষণ আইন সংশোধিত হয়। তখন থেকেই পুলিশি হেফাজতে ধর্ষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। (রাকেশ জানা, ‘নগ্ন নারী : শক্তির আধার, প্রসঙ্গ ‘দ্রৌপদী’, পৃ. ১৩৫-৩৬) এই গল্প শুধু নারীত্বের অপমানে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়। বরং নারীত্বের খোলস পরিত্যাগ করে মনুষ্যত্বের মহিমায় ঘৃণ্যতম পাশবিক অত্যাচারের প্রতি তীব্রতর প্রতিবাদ।

সেনানায়কের বক্তব্য অনুযায়ী ‘ওকে বানিয়ে নিয়ে এস’। এই বানিয়ে নিয়ে আসা অর্থাৎ একাধিক পুরুষ তার ওপর অসহ্য শারীরিক অত্যাচার করে। তার হাত পা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় তাকে ধর্ষণ করে। এই ভাবেই তারা নিজের পৌরুষত্ব দেখায়। নিজেকে বাঁচানোর জন্য দ্রৌপদীর সেই সময় কিছু করার থাকে না। সে ধর্ষিত হতে হতে অজ্ঞান হয়, জ্ঞান ফিরে দেখে ধর্ষণ হচ্ছে, আবার সে চোখ বন্ধ করে নেয়। তবু তার সহ্যের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার প্রতিবাদ। জল তেষ্ঠা পেলে সে দাঁত দিয়ে জিভ চেপে ধরে। যাতে একটু করুণা এই অমানুষদের কাছে থেকে না নিতে হয় এবং সে যে করুণার পাত্রী নয় গল্পের শেষে মহাশ্বেতা দেবী তা স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন। লেখিকা নারীর নগ্নতাকে শক্তির আধার হিসেবে তুলে ধরেছেন। যখন রেডিওতে খবর পাঠানো হয় দ্রৌপদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তখন সকাল বেলা। কোথাও কেউ জানতে পারে না গ্রেফতারের পরে কী করা হয়েছে। কারণ এইসব মানুষদের দুঃখ, কষ্ট, মান-সম্মান, ইজ্জত সম্বন্ধে উপরতলার তথাকথিত ভদ্র মানুষদের কোনো মাথাব্যথা থাকে না। নারী শুধু ভোগের সামগ্রী। এই দ্রৌপদীকে বাঁচানোর জন্য কোনো কৃষ্ণ থাকে না। এই দ্রৌপদী নিজেই নিজের কৃষ্ণ হয়ে ওঠে। নিজের ইজ্জত হারিয়ে তার কাছে ভয় পাওয়ার, হারানোর আর কিছু থাকে না। ফলে তার আত্মহীন দেহই তার অস্ত্র হয়ে ওঠে। যে দেহের আত্ম সে বাঁচাতে পারেনি, সেই দেহ দিয়ে সে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করে। গল্পের শেষে বস্ত্রহীন অবস্থায় সে উজ্জ্বল দিনের আলোতে বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন তথাকথিত ভদ্র মানুষদের লজ্জা জেগে ওঠে। ভদ্রতা, সভ্যতা হঠাৎ করে তাদের মনে পড়ে যায়। যে দেহের উপর সারারাত তারা অত্যাচার করেছে সেই অত্যাচার করতে তাদের লজ্জা করেনি। সেই দেহ দিনের উজ্জ্বল আলোতে দেখে তারা কাপড় দিয়ে দ্রৌপদীর দেহ ঢাকতে চেয়েছে। কিন্তু দ্রৌপদী এখানে অনন্য। যে দেহকে সে রাতে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখতে এবং অসহ্য অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে সেই দেহ সে কাপড় দিয়ে আর ঢাকতে দেয়নি। সে নিজের ক্ষতবিক্ষত মুখের রক্ত মুছতে মুছতে সেনা নায়কের উদ্দেশ্যে বলে—

“বানিয়ে আনতে বল্যেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না? ... দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মত ভীষণ, আকাশচেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কি হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু? চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুথু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শাটটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব।”^{২৫}

—এখানেই সে পুরুষের পৌরুষত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এইখানে সমাজকে ভাবতে বাধ্য করেছে যে পুরুষের পৌরুষত্ব কীসে? যে পুরুষ একজন নারীকে যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা দিতে পারে না সেইখানে কি তার পৌরুষত্ব নিজের ঐশ্বর্য দেখায়? পৌরুষত্ব কোথায় বেশি শক্তিশালী? একজন নারীর উপর অত্যাচারের সময়? তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব পুরুষের পৌরুষত্বে থাকে না? দ্রৌপদী তাদেরকে কাপড় পরানোর সুযোগ দেয় না –

“দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।”^{২৬}

এই ভয় দ্রৌপদী তার নিজের শক্তি দিয়ে জাগাতে পেরেছে। সে সবকিছু হারিয়েও নিজে হেরে যায়নি। শক্তিশালী শক্তি তার দেহের আত্মকেড়ে নিতে পারে, কিন্তু তার ভেতরের তেজ কেড়ে নিতে পারেনি। সে অত্যাচারিত হয়েছে। কিন্তু সে মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করেনি। মরে যাওয়ার আগে সে নিজের যথার্থ শক্তি দিয়ে উচ্চবৃত্তের এই প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। অস্ত্রহীন অবস্থায় অস্ত্রধরের মনে ভয় জাগাতে পেরেছে। একদা আই ভি রহমানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা বলেছিলেন—

“দ্রৌপদী গল্প বিশেষ একটা আন্দোলনের কথা নিয়ে লিখেছি। ৭০-এর দশকে বিশেষ একটা জায়গায় আদিবাসীদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাদের জায়গা জমি সব চলে যাচ্ছিল, সমস্ত জিনিসটাই একটা প্রতিবাদমূলক পটভূমি তৈরি করেছিল, দ্রৌপদী যখন উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে তখন কিন্তু চরম একটা চপেটাঘাত সমাজের মুখেই পড়ে তাই না? গল্পের শেষে সেনানায়ক কিন্তু একেবারেই পরাজিত। তারা শুধু একটা মেয়েকে উলঙ্গ করতে পারে— লালসা চরিতার্থ করতে পারে কিন্তু সম্মান দিতে পারে না। কিন্তু দেখো এই ঘটনার পর সমাজের মানুষ কিন্তু দ্রৌপদীকেই সম্মান করে তাই না? এই সম্মান দ্রৌপদী আদায় করে নিয়েছে। আমি চাই সমাজের দ্রৌপদীরা সবাই এইভাবেই জেগে উঠুক। কেড়ে নিক তাদের প্রাপ্য। পরাজিত হয়ে যাক ওই সব সেনানায়ক সব সমাজেই।”^{২৭}

এখানে দ্রৌপদী তিনটি শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে। সে নারী, নকশালবাদী এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তিনভাবে সে শোষিত এবং শাসিত। নারী হিসেবে পুরুষ তাকে শাসন করছে, নকশাল হিসেবে উচ্চপদস্থ কর্মচারী শাসকের প্রতিনিধি হিসেবে তার উপর অত্যাচার করছে এবং আদিবাসী হিসেবে তথাকথিত শিক্ষিত উচ্চবর্গ সমাজের প্রতিনিধি সেনানায়ক তাকে মানুষ হিসেবে গণ্য করছে না। কিন্তু ক্ষমতাতত্ত্বের নিম্নে অবস্থিত হয়েও সে নিজের জোরে আত্মবিশ্বাসে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। সে নিজেই নিজের শক্তি হয়ে উঠেছে। সেই কারণে এই গল্প বাংলা সাহিত্যে আজীবন উজ্জ্বল আলোক শিখা হয়ে থাকবে। এই কারণে দ্রৌপদীর প্রতিবাদ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধে আলোচ্য এই চারটি গল্পে দেখা যায় সাধারণ মানুষ নিজেদেরকে বাঁচাতে নিজেরা শক্তির আঁধার হয়ে উঠেছে। তথাকথিত উচ্চশ্রেণি তাদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদেরকে দমন করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তা করতে পারেনি। প্রত্যেকটি গল্পে প্রতিবাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে।

Reference:

১. পাত্র, অমলেশ, ‘মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে নিম্নবর্গের চেহারা’, ‘বল্লীক’ (বিশেষ ক্রোড়পত্র, স্মরণে-চিন্তনে হাজার চুরাশির মা’, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০১৬, পৃ. ৯৪
২. গুহ, রনজিৎ, ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, গৌতম ভদ্র (সম্পাদ), ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, কলকাতা, প্রতিভাস, ১৯৯৮, পৃ. ৩২

৩. চৌধুরী, অভিজিৎ, ‘সাবঅল্টার্নিটিজম ও মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস’, ‘মহাশ্বেতার মহাবিশ্ব’, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ১৫
৪. দেবী, মহাশ্বেতা, ‘বেহুলা’, ‘বেহুলা’, কলকাতা, অন্যধারা, পৃ. ১০২
৫. তদেব, পৃ. ১০১
৬. দেবী, মহাশ্বেতা, ‘ভূমিকার পরিবর্তে’, রঞ্জন মিত্র (সম্পাদিত), ‘মহাশ্বেতা দেবী : সাহিত্যের সেরা গল্প’
<https://www.ebanglalibrary.com/books/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87/> DOR ২৩/০৬/২০২৬
৭. দেবী, মহাশ্বেতা, ‘বিছন’, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, ২য় সং, কলকাতা, দে’জ পাবলিকেশন, পৃ. ১৬১
৮. তদেব, পৃ. ১৬৩
৯. তদেব, পৃ. ১৬৬
১০. তদেব, পৃ. ১৭০
১১. ঘোষ, সুবোধ, ‘ফসিল’, ‘ফসিল’ চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড, ১৩৫৭, পৃ. ১৮
১২. মহাশ্বেতা দেবী, ‘বিছন’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
১৩. প্রেমচন্দ, ‘সদগতি’ (অনুবাদক অমলকুমার রায়), পবিত্র সরকার এবং অন্যান্য (সম্পাদিত), ‘প্রেমচন্দ গল্পসমগ্র’, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, ১৯৫৮, পৃ. ৪৮৯
১৪. দেবী, মহাশ্বেতা, ‘দ্রৌপদী’, ‘মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন (লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত)’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি, ১৯৯৩, পৃ. ৩৫
১৫. তদেব, পৃ. ৩৯
১৬. তদেব, পৃ. ৩৯
১৭. জানা, রাকেশ, ‘নগ্ন নারী : শক্তির আধার, প্রসঙ্গ ‘দ্রৌপদী’, সন্দীপ বর এবং রাকেশ জানা (সম্পাদিত), ‘বাংলা ছোটগল্প বিচিত্র ভাবনা’, কলকাতা, একুশতক
<https://mcconline.org.in/download/publication-rnd/PUB1053.pdf> DOR ০১/০৭/২০২৬
- (দ্রষ্টব্য : রহমান, আই ভি, ‘মহাশ্বেতা দেবীর সাথে এক সন্ধ্যা’, ‘এই দেশ’ পত্রিকা, ঢাকা, ৫ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার, ২০১৪)

Bibliography:

- গুহ, রনজিৎ, ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, গৌতম ভদ্র (সম্পাদিত), ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, কলকাতা, প্রতিভাস, ১৯৯৮
- চৌধুরী, ভূদেব, ‘বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার’, কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬১
- চৌধুরী, ভূদেব, ‘বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’ -
<https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.266200/mode/1up> DOR ২৮/০৬/২০২৬
- চৌধুরী, অভিজিৎ, ‘সাবঅল্টার্নিটিজম ও মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস’, ‘মহাশ্বেতার মহাবিশ্ব’, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১০
- জানা, রাকেশ, ‘নগ্ন নারী : শক্তির আধার, প্রসঙ্গ ‘দ্রৌপদী’, সন্দীপ বর এবং রাকেশ জানা (সম্পাদিত), ‘বাংলা ছোটগল্প বিচিত্র ভাবনা’, কলকাতা, একুশতক,
<https://mcconline.org.in/download/publication-rnd/PUB1053.pdf> DOR ০১/০৭/২০২৬
- দত্ত, বীরেন্দ্র, ‘বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ’, ১ম খণ্ড, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৫৫

দাস, পাপিয়া, “মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্পে দিকু সমাজের দ্বারা অত্যাচারিত নারীদের জীবনচিত্র”, নিত্যানন্দ দাস (সম্পাদিত), ‘কথাসাহিত্যে নারী’, নগাঁও: অসম, আনন্দ প্রকাশ, ২০২৫
মজুমদার, উজ্জল, ‘গল্পচর্চা’, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮
বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদ্যুতি, ‘কথাসাহিত্যপ্রকরণ’, কলকাতা, বি.বি. কুণ্ডু গ্রাণ্ড সন্স, ২০০৬
মাজী, বিপ্লব, ‘দলিত আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের সাহিত্য’, ১ম সং, কোডেক্স, কলকাতা, ২০১৭
সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, ‘বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ’, কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ১৯৯৮

পত্রিকা :

দে, অমর (সম্পাদিত), ‘গল্প সরণি’ (মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা), ষোড়শ বর্ষ বার্ষিক সংকলন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭
পাত্র, অমলেশ, “মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে নিম্নবর্ণের চেহারা”, ‘বঙ্গীক’ (বিশেষ ক্রোড়পত্র, স্মরণে-চিন্তনে হাজার চুরাশির মা’, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০১৬
মল্লিক দীপঙ্কর এবং মল্লিক দেবারতি (সম্পাদিত), ‘তবু একলব্য’ (মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা), জুলাই সেপ্টেম্বর ২০১৮, তৃতীয় প্রকাশ ২৩/০৯/২০১৫
মাইতি, অভিজিৎ (সম্পাদিত), ‘স্বপ্ন খেয়া’ (স্মরণ ও সাহিত্য, হাজার চুরাশির মা), জুলাই ২০১৭
সিনহা, বনানী (সম্পাদিত), ‘মনছবি’ (মহাশ্বেতা দেবীর সংখ্যা), বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৮